ইউনিট ১
গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব

ইউনিট ১ গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব

আমাদের জীবনে গৃহপালিত পশুর (domestic animal) গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীতে বহু ধরনের পশু রয়েছে। এসব পশুর মধ্যে অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে মানুষ যেগুলোকে স্থায়ীভাবে লালনপালন করে এবং বংশবৃদ্ধি ঘটায় তাদের গৃহপালিত পশু বলে। আমাদের দেশে গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া বিশেষভাবে পরিচিত। অন্যান্য দেশে গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া ছাড়াও উট, গাধা, হাতি, খরগোশ, ঘোড়া এবং আরও অনেক ধরনের গৃহপালিত পশু রয়েছে। গৃহপালিত পশুর আদিবাস ছিল জঙ্গলে। কেন, কীভাবে এবং কখন গৃহপালিত পশু মানুষের সান্নিধ্য লাভ করল তার সঠিক ইতিহাস জানা যায় নি। তবে, যেটুকু জানা গেছে তার আলোকে বলা যায়, আদি মানুষও পশুর সঙ্গে জঙ্গলে বাস করতো। তখনকার দিনেও মানুষ অন্নবস্ত্রের জন্য পশুনির্ভর ছিল। তারা মাংস ভক্ষণ করে ক্ষুধা মেটাতো, চামড়া পরিধান করে শীত ও লজ্জা নিবারণ করতো। হিংস্র জন্তু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য চামড়ার তাবু ব্যবহার করতো। যখন প্রস্তর যুগ এল মানুষ ঘর-বাড়ি তৈরি করা শিখল। জঙ্গল থেকে পশু শিকার করে বাড়িতে আনতে লাগল। এতে তাদেরকে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হতে হতো। যেমন- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়বৃষ্টি, সব মৌসুমে শিকার না পাওয়া, জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ ইত্যাদি। এসব অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে পরবর্তীতে মানুষ জঙ্গল থেকে জীবিত পশু ধরে বাড়িতে এনে বেঁধে রাখতো এবং এদেরকে পালন করতো। এভাবেই শুরু হয়েছিল বাড়িতে পশুপালন। মধ্যযুগে কৃষি, পরিবহণ এবং খাদ্য উৎপাদনে পশুর অবদান প্রধান ছিল। বর্তমান শিল্প বিপ্লবের যুগে কৃষি, শিল্প, খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৃহপালিত পশু অবদান রাখছে। গৃহপালিত পশু থেকে দুধ, মাংস ছাড়াও নানা প্রকার উপজাত দ্রব্য, যেমন- শিং, খুর, চামড়া, পশম, চর্বি, রক্ত, দাঁত, হাড়, নাড়িভুঁড়ি পাওয়া যায়। দুধ ও মাংস মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উপজাত দ্রব্য থেকে নানাবিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। আমাদের দেশে গৃহপালিত পশু একটি বিরাট সম্পদ। এ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারলে আমাদের বর্তমান জাতীয় প্রকট সমস্যাসমূহ, যেমন- বেকার সমস্যা ও আমিষের অভাব সমাধান করা সম্ভব হবে। এছাড়াও ভবিষ্যতে এদেশের দারিদ্রতা দূর করে গৃহপালিত পশু থেকে অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

এই ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে বাংলাদেশের পশুপাখি ও এদের থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিসংখ্যান, কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দারিদ্র দূরীকরণে গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১.১ বাংলাদেশে পশুপাখি ও উৎপাদিত দ্রব্যের পরিসংখ্যান

এই পাঠ শেষে আপনি-

- এদেশের গৃহপালিত পশুর অতীত ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পশুসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে বাংলাদেশের মানুষের করণীয় বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এদেশের গৃহপালিত পশু ও উৎপাদিত দ্রব্যের পরিসংখ্যান ছক আকারে তুলে ধরতে পারবেন।

বাংলাদেশে গৃহপালিত পশুর অতীত ও বর্তমান অবস্থা

অতীতে বাংলাদেশে প্রায় সব বাড়িতেই গরু, মহিষ, ভেড়া ও ছাগল পালন করা হতো। এদের মধ্যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ছাড়া অন্য কোনো পশুর জাতই উন্নত নয়। সনাতন পদ্ধতিতে দেশের মানুষ এসব পশু পালন করতো। তথাপি তখনকার দিনে এভাবেই বাংলাদেশের মানুষের দুধ ও মাংসের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল। এর প্রধান কারণ-

অতীতে দেশী জাতের পশু সনাতন পদ্ধতিতে পালন করা হতো।

- গৃহপালিত পশুর সংখ্যা কম থাকায় পর্যাপ্ত পশু খাদ্যের যোগান সম্ভব ছিল।
- লোকসংখ্যা কম থাকায় চাহিদা কম ছিল এবং পর্যাপ্ত চারণভুমি পাওয়া যেত।
- শস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় গৃহপালিত পশুর জন্য ঘাস উৎপাদিত হতো।
- পর্যাপ্ত পশু খাদ্য সরবরাহের জন্য পশু থেকে বেশি উৎপাদন পাওয়া যেত।

বর্তমানে উন্নত জাতের গরুর মাধ্যমে দেশী গরুর জাত উন্নয়ন করা হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের সে অবস্থা আর নেই। স্ফীত জনসংখ্যার আমিষের চাহিদা মেটানো দুরূহ হয়ে পড়েছে। দেশী জাতের পশুর মাংস ও দুধ দিয়ে বর্তমান চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে পশুপালনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার বেশ কয়েক বছর আগে হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান ও জার্সি জাতের দুধ উৎপাদনকারী গরু এনে এদেশে দেশী গরুর জাত উন্নয়নের চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশে গৃহপালিত পশুর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননের জন্য মোট ২২টি কেন্দ্র এবং ৪২৫টি উপকেন্দ্র আছে। আমাদের দেশের পশু বাছাই প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ঘটালে এদের উৎপাদন ক্ষমতাও লাভজনক হারে বাড়ানো সম্ভব হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১.৫০ মিলিয়ন কর্মক্ষম লোক দেশের অর্থনীতিতে যোগ হচ্ছে। এদের জন্য কাজ দরকার। দেশের আবাদি জমির পরিমাণ মাথাপিছু মাত্র ০.২১ একর। এর সম্প্রসারণও সম্ভব নয়। এজন্য দরকার অল্প জায়গায় অধিক উৎপাদন। এ লক্ষ্যে দেশের পশুসম্পদ বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

বর্তমানে আমাদের দেশে বেসরকারীভাবে ৩০,০০০ দুগ্ধ ও ৬২,০০০ মুরগি খামার স্থাপিত হয়েছে।

দেশের পশুসম্পদ উন্নয়নের সম্ভাবনা গত বছরগুলোতে প্রমাণিত হয়েছে। দশ বছর আগে যেখানে দেশের কোথাও বেসরকারী পর্যায়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন একটি খামারও ছিল না, বর্তমানে দেশে বেসরকারী পর্যায়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন ৩০ হাজার দুগ্ধ খামার ও ৬২ হাজার মুরগি খামার গড়ে ওঠেছে। পাশাপাশি এসব খামার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

পশুসম্পদ উন্নয়নের ফলে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার পূর্বের শতকরা ৩.০ ভাগ থেকে বেড়ে ১৯৯৫-এ ৯.০ ভাগ-এ দাঁড়িয়েছে। গুড়ো দুধ আমদানির পরিমাণ বছরে পূর্বের ৪৫০ কোটি টাকা থেকে কমে ১৪০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা, উন্নত বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা ও গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারলে এদেশের পশুসম্পদ অদূর ভবিষ্যতে আরও সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠবে বলে আশা করা যায়।

পশুসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে এদেশের মানুষের করণীয়

পশুসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পালন করতে হবে। যথা-

- গৃহপালিত পশু বিজ্ঞানসম্মতভাবে পালন করতে হবে।
- পশু থেকে প্রাপ্ত উপজাত দ্রব্য বৈজ্ঞানিকভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে ব্যবহার করতে হবে।
- উন্নত খাদ্য ও প্রজনন ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল পশুর সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- বিজ্ঞানসম্মতভাবে পশু পালন করে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বাড়াতে হবে।
- কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গ্রাম ছেড়ে শহর অভিমুখী না হয়ে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে লাভজনকভাবে গবাদিপশুর খামার গড়তে হবে।
- পশু বিশেষজ্ঞদের কর্তব্য হবে এদেশের পরিবেশ অনুযায়ী সীমিত সম্পদের বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে পশুপালনে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। বিদেশী কাঠামোকে হুবহু অনুসরণ না করে পথ নির্দেশনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পশুপালন বিষয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সম্প্রসারণে সরকারকে আরও তৎপর হতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের জন্য পশুসম্পদ বিষয়ক বিভিন্নমুখী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গবাদিপশু এবং এগুলো থেকে উৎপাদিত দ্রব্য এবং উপজাত দ্রব্যসামগ্রী বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা করতে হবে।
- বিত্তহীন ও ভূমিহীন লোকের জন্য ঋণের ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারণ করতে হবে।
- গবেষণার জন্য আর্থিক সুযোগসুবিধা ছাড়াও গবেষণা সম্পর্কিত সকল বাধা দূরীকরণে সরকার ও জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। গবেষণার ফলাফল সঠিকভাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা নিতে হবে। কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

পশুসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারলে বাংলাদেশও একদিন ধনী হয়ে ওঠবে।

আমাদের বিপুল জনশক্তি বিজ্ঞানভিত্তিতে পশুসম্পদ লালনপালন করতে পারলেই পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশও একদিন ধনী হয়ে ওঠতে পারবে।

বাংলাদেশের পশুসম্পদ ও উপজাত দ্রব্যের পরিসংখ্যান

বাংলাদেশের পশুসম্পদ ও এদের থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য এখানে সারণির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

সারণি ১ ঃ গৃহপালিত পশুর পরিসংখ্যান (মিলিয়ন)

প্রজাতি	সাল (১৯৯৬)
গরু	২১.৫৭
মহিষ	০.৭২
ছাগল	১২.৯২
ভেড়া	১.৬৯
মুরগি	৯৭.৫৫
হাঁস	২৯.১২
জনসংখ্যা	১২৩.৫২

সারণি ২ ঃ দেশে দুধ, মাংস ও ডিমের বর্তমান উৎপাদন ও প্রয়োজনীয়তার উপাত্ত (১৯৯৯-২০০০ সালের)

পণ্য	জনপ্রতি (প্রতিদিন)		সর্বমোট (বার্ষিক)		সর্বমোট
	প্রয়োজন	উৎপাদন	প্রয়োজন	উৎপাদন	ঘাটতি
দুধ	২৫০ মি.লি.	৩৭.০ মি.লি.	১১.৮৪ মিলিয়ন টন	১.৭৫ মিলিয়ন টন	১০.০৯ মিলিয়ন টন
মাংস	৬০.০ গ্রাম	১৪.২৫ গ্রাম	৭.৭৮ মিলিয়ন টন	০.৬৭ মিলিয়ন টন	৭.১১ মিলিয়ন টন
ডিম	২.০/সপ্তাহ	০.৬১/সপ্তাহ	১৩৪৯৯.২ মিলিয়ন	৪১৭৭.০ মিলিয়ন	৯৩২২.০ মিলিয়ন

সারণি ৩ ঃ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ও প্রাপ্ত পশুশক্তি এবং প্রতিবছর উৎপাদিত গোবরের একটি হিসাব

চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পশুশক্তি	চাষের জন্য প্রাপ্ত পশুশক্তি	বার্ষিক উৎপাদিত গোবর
৪৯৪২.৩ মেগাওয়াট	১৩৭২.২ মেগাওয়াট	৮০.৫ মিলিয়ন টন

সারণি ৪ ঃ পশুসম্পদ থেকে বার্ষিক উৎপাদিত, ব্যবহৃত ও রপ্তানিকৃত চামড়ার হিসাব

চামড়ার উৎস	পরিমাণ (মিলিয়ন বর্গ মিটার)		
	দেশে ব্যবহার	রপ্তানি	মোট
গরু	২.৪১১	১০.৩৮	১২.৮৫৫
মহিষ	০.২৫১	---	০.২৫৪
ছাগল	০.১৫৭	১.৬৭১	১.৮৩৭
ভেড়া	০.০৪৭	০.০০৩	০.০৫৯
মোট	২.৮৬৬		১৫.০০৫

* পাঁচ বছরের গড় হিসাব (১৯৮৬-'৮৭ থেকে ১৯৯০-'৯১)

উৎস ঃ আলম, বি. এল. আর. আই., সাভার, ঢাকা।

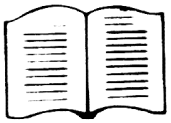

সারমর্ম ঃ অতীতে দেশী জাতের পশু সনাতন পদ্ধতিতে পালন করা হতো। বর্তমানে বিদেশ থেকে উন্নত জাতের গরু আমদানি করে তাদের মাধ্যমে দেশী গরুর জাত উন্নয়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে এদেশে বেসরকারীভাবে ৩০,০০০ দুগ্ধ খামার ও ৬২,০০০ মুরগি খামার স্থাপিত হয়েছে। ফলে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার পূর্বের ৩.০% থেকে বেড়ে ১৯৯৫ সালে ৯.০%-এ উন্নীত হয়েছে। পশুসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারলে বাংলাদেশও একদিন ধনী হয়ে উঠবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। পশুসম্পদ উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯৫ সালে কত ছিল?
- ক) ৫.০%
- খ) ৯.০%
- গ) ৩.০%
- ঘ) ৮.০%

২। ১৯৯৪-ঞ৯৫ সালে বাংলাদেশে গরুর সংখ্যা কত ছিল?
- ক) ২৩.৩৯ মিলিয়ন
- খ) ২২.৩৮ মিলিয়ন
- গ) ২৩.৩২ মিলিয়ন
- ঘ) ২০.৪৫ মিলিয়ন

৩। বর্তমানে জনপ্রতি কতটুকু দুধ উৎপাদিত হয়?
- ক) ৩০.০ মি.লি.
- খ) ৩৫.০ মি.লি.
- গ) ৩৪.০ মি.লি.
- ঘ) ৪০.০ মি.লি.

৪। ১৯৮৬-'৮৭ থেকে ১৯৯০-'৯১ সাল পর্যন্ত গড়ে বাংলাদেশে ব্যবহৃত গরুর চামড়ার পরিমাণ কত বর্গ মিটার ছিল?
- ক) ২.৪০০ মিলিয়ন
- খ) ২.৪১১ মিলিয়ন
- গ) ২.৩২১ মিলিয়ন
- ঘ) ২.৪০৩ মিলিয়ন

পাঠ ১.২ কৃষিকাজে পশুর গুরুত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষিকাজে গবাদিপশুর প্রত্যক্ষ ব্যবহার বলতে ও লিখতে পারবেন।
- ধান মাড়াই, আখ মাড়াই, ঘানি টানা প্রভৃতি কৃষির সাথে সম্পর্কিত কাজে পশুর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

কৃষি কাজে পশুসম্পদের বিরাট অবদান রয়েছে।

মাঠে শস্য উৎপাদন ছাড়াও পশুপাখি এবং মাছ চাষও কৃষিকাজের অন্তর্ভুক্ত। কৃষির সাথে সম্পর্কিত প্রায় প্রতিটি কাজে গবাদিপশুর কিছু না কিছু অবদান রয়েছে। তবে, মাঠে ফসল উৎপাদনে গবাদিপশুর অবদান সবচেয়ে বেশি। কারণ, বাংলাদেশের সকল কৃষিযোগ্য ভূমি যান্ত্রিক চাষের অধীনে আনা আপাতত সম্ভব নয়। এদেশে পশুশক্তিকে একেবারে বাদ দিয়ে যান্ত্রিক চাষের প্রচলন করতে আরও সময় লাগবে। তাই আমরা বলতে পারি, এদেশে কৃষি আয়ের সিংহভাগই নির্ভর করছে পশুসম্পদের ওপর। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও কৃষিকাজে পশুশক্তির ব্যবহার হয়। এক তথ্য থেকে জানা যায়, আমাদের দেশে হালচাষ, গাড়ি টানা ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত শক্তি এবং গোবর, চনা ইত্যাদির দাম ধরলে পশুসম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে প্রায় ১৫.০% অবদান রাখে।

ফসল উৎপাদন করার জন্য যেসব কাজে প্রত্যক্ষভাবে পশুশক্তির ব্যবহার হয়ে আসছে সেগুলো হলো—

- জমিতে হালচাষ করা,
- শস্যক্ষেতে শস্য নিড়ানি,
- পশুচালিত পরিবহন,
- জমিতে গোবর ও কম্পোস্ট সারের ব্যবহার প্রভৃতি।

এদেশে হালচাষের কাজে গরু ও মহিষই ব্যবহার করা হয়।

হালচাষ

জমিতে বীজ বপনের পূর্বে মাটি নরম করার জন্য চাষ করতে হয়। এজন্য বাঁশ বা কাঠের তৈরি লাঙ্গল ও মই ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ষাঁড় বা মহিষ দিয়ে লাঙ্গল ও মই টানা হয়। একেই হালচাষ বলে। ষাঁড়, মহিষ প্রভৃতি সাধারণত হালচাষের কাজে ব্যবহার করা হয়। আগেকার দিনে যখন কলের লাঙ্গল ছিল না তখন হালচাষ সম্পূর্ণভাবে গবাদিপশুর ওপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে জমি চাষ করার জন্য ট্র্যাক্টর বা কলের লাঙ্গল ব্যবহার করা হয়। কিন্তু খন্ড খন্ড জমিতে ট্র্যাক্টর চালানো যায় না। ব্যক্তিমালিকানাধীনে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত খন্ড খন্ড জমির সৃষ্টি হয়। এসব জমিতে ট্র্যাক্টরের পরিবর্তে পশুচালিত লাঙ্গলের ব্যবহার হয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, যেমন- ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিশর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে এখন পর্যন্ত ট্র্যাক্টর অপেক্ষা পশুচালিত লাঙ্গলের প্রচলন বেশি।

আমাদের দেশে ষাঁড় ও মহিষ জমি চাষে ব্যবহার করা হয়। এদেশে ১০.৮২ মিলিয়ন হালের গরু আছে। গবেষণা থেকে জানা যায়, একটি মহিষ প্রত্যহ ৫ ঘন্টা কাজ করলে ৫২০ মেগাওয়াট শক্তি ব্যয় হয় এবং কোনো বিরতি ছাড়াই একটানা কয়েকঘন্টা কাজ করতে পারে। একজোড়া বলদ দৈনিক এক একর জমির এক-তৃতীয়াংশ চাষ করতে পারে। হালের পশুর সংখ্যার অভাব মাত্র ৭.৮৫% হলেও মোট কর্ষণ শক্তির অভাব প্রয়োজনের তুলনায় ৪০.৮%। কারণ, প্রতিটি পশুর শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ০.২৫ হর্স পাওয়ার থেকে কমে ০.১৭ হর্স পাওয়ারে দাঁড়িয়েছে। খাদ্য ও প্রজননের জন্য উন্নতমানের ষাঁড়ের অভাবই এর প্রকৃত কারণ। দেশে ২৩.৩৪ মিলিয়ন একর কৃষিভূমির জন্য মোট ৪৯৪২.৩ মিলিয়ন মেগাওয়াট শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু, পশু ও অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া যায় মাত্র ২৯২২.৪ মেগাওয়াট। এরপরও আরও ২০১৯.৮ মিলিয়ন মেগাওয়াট শক্তির প্রয়োজন থেকে যায়।

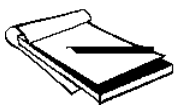

অনুশীলন (Activity) ঃ *ধরুন, আপনার ৫টি মহিষ আছে। প্রতিটি মহিষ দৈনিক ৫ ঘন্টা করে কাজ করলে সর্বমোট কতটুকু শক্তি ব্যয় হবে?*

চিত্র ১ ঃ গরুর সাহায্যে হালচাষ করা হচ্ছে

পশু থেকে কতটুকু শক্তি পাওয়া যাবে তা নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর। যথা-

- পশুর দৈহিক বৈশিষ্ট্য, দেহের গঠন, ওজন ও জাত।
- পশুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য।
- জলবায়ু, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা।
- পশুর লিঙ্গ (স্ত্রী/পুরুষ)।
- জোয়াল ও মইয়ের আকার, ওজন ও শারীরিক গঠন ইত্যাদি।

সারণি ৫ ঃ খামারপ্রতি ও একরপ্রতি উৎপাদিত পশুশক্তি জরিপের একটি প্রতিবেদন

খামারের প্রকৃতি/স্তর	খামারপ্রতি গড়ে শক্তি উৎপাদনকারী পশুর সংখ্যা		গাড়ির ব্যবহার (%)	প্রতি একরে শক্তি উৎপাদনকারী পশুর
	ষাঁড়	গাভী		সংখ্যার গড়
ভূমিহীন	--	--	--	--
প্রান্তিক	০.০০	০.৩৩	১০০.০	১.৪৬
ছোট	০.২৭	০.৪৮	৬৪.০	০.৬১
মাঝারি	০.৫৮	০.৭২	৫৫.০	০.৩৬
বড়	১.৬০	০.৯৮	৩৭.০	০.৩২
সকল খামার	০.৬৩	০.৬৪	৫০.০	০.৩৬

উৎস ঃ ওয়াহিদ (১৯৮৫), পশুশক্তির প্রয়োজনীয়তা নিরূপন জরীপ প্রকল্প, বি.এ.আর.সি., ঢাকা।

এদেশে গ্রামীণ পরিবহনে প্রধানত গরু ও মহিষের গাড়ি ব্যবহার করা হয়।

পশুচালিত পরিবহন

কৃষির সঙ্গে পরিবহন গভীরভাবে সম্পর্কিত। বীজ, যন্ত্রপাতি, সার প্রভৃতি মাঠে আনা-নেয়া, ফসল বাড়িতে ও বাজারে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতির জন্য পরিবহনের প্রয়োজন। এসব কাজের জন্য পৃথিবীর

চিত্র ২ ঃ গ্রামীণ পরিবহনে গবাদিপশু

বিভিন্ন দেশে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মহিষের গাড়ির প্রচলন আছে। উন্নয়নশীল দেশে যেসব অঞ্চলে পাকা রাস্তা নেই সেখানকার মানুষ পশুচালিত পরিবহনের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। পাকিস্তান, ভারত, আফ্রিকা ও আরব দেশগুলোতে পশুচালিত পরিবহণের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মহিষ ও গরুর গাড়ি প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়।

কৃষির বিভিন্ন কাজে কৃষক প্রধানত এসব গাড়ি ব্যবহার করেন। কারণ–

- বেশিরভাগ গ্রামে পাকা রাস্তা নেই।
- দরিদ্র কৃষক বেশি মূল্য দিয়ে মোটরযান ভাড়া করতে পারে না।
- ক্ষেতের আইলের উপর দিয়ে পশুচালিত পরিবহণ চালানো যায়।
- এসব গাড়ির দাম ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।

কৃষির অন্যান্য কাজে পশুর গুরুত্ব

মাঠে ফসল উৎপাদন ছাড়াও কৃষির সঙ্গে জড়িত আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে, যেমন– শস্য নিড়ানি, ধান মাড়াই, আখ মাড়াই, শস্য ভাঙ্গানো ইত্যাদি। এগুলোতেও পশুর ব্যবহার হয়ে থাকে।

গরুর সাহায্যে মারাকাচি টেনে শস্যক্ষেতের আগাছা দূর করা যায়।

শস্য নিড়ানি

শস্যক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার না করলে শস্যের ক্ষতি হয়। আগাছা পরিষ্কার করার পদ্ধতিকে নিড়ানি বলে। এজন্য কাঠ দিয়ে লম্বা চিরুনির মতো যন্ত্র তৈরি করা হয়। দেশীয় ভাষায় এটিকে মারাকাচি আঁচড়া বলে। মই ও লাঙ্গলের মতোই মারাকাচিও গরু দিয়ে টানা হয়। তাতে আগাছা উঠে আসে। কয়েকদিনের মধ্যেই সে আগাছা রৌদ্রে শুকিয়ে যায় ও মাঠ আগাছামুক্ত হয়।

চিত্র ৩ ঃ শস্য নিড়ানিতে গবাদিপশু

জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধিতে রাসায়নিক সারের তুলনায় গোবর সার উত্তম।

জমিতে গোবর সারের ব্যবহার

বাংলাদেশের কৃষিজমি দিন দিন অনুর্বর হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক মাত্রা ও অনুপাতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার। কৃষিজমির উর্বরাশক্তি ফিরে পেতে হলে গবাদিপশুর গোবর সার অত্যন্ত প্রয়োজন। এ সার একদিকে যেমন মাটির সার্বিক অবস্থা উন্নত করে অন্যদিকে অধিক ফসল ঘরে তুলতে সাহায্য করে। কাজেই প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কৃষি উন্নয়নে পশুসম্পদের ভূমিকা অপরিসীম।

গোবর কিছুদিন মাটির গর্তে রাখলে পচে উত্তম সারে রূপান্তরিত হয়। এটা কালো রঙের ও মাটির মতো নরম। এ সার আদিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে আমাদের দেশের গোবরে শতকরা ১.৪০-২.০ ভাগ নাইট্রোজেন, ০.৯০-১.০ ভাগ ফসফরাস এবং ০.৭০-০.৮০ ভাগ পটাশিয়াম থাকে। এক টন গোবরের শুষ্ক পদার্থে গড়ে ১৭০ কেজি জৈব পদার্থ, ৪.৬ কেজি নাইট্রোজেন, ১.৯০ কেজি ফসফরাস ও ১.৫০ কেজি পটাশিয়াম পাওয়া যায়। এদেশের গোমূত্রে ০.০৪-০.৯% নাইট্রোজেন, ০.১৩-০.৪০% পটাশিয়াম, ০.০২-০.১৩% ফসফরাস থাকে। তবে, গবাদিপশুর গোবর ও মূত্রের রাসায়নিক গঠন অবশ্যই খাদ্যের

গুণাগুণের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে বর্তমানে ৮০ মিলিয়ন টন কাঁচা বা ২২ মিলিয়ন টন শুকনো গোবর উৎপন্ন হয় যা বর্তমানের রাসায়নিক সারের ১০%।

কম্পোস্ট অত্যন্ত উন্নতমানের সার।

কম্পোস্ট বা আবর্জনা সার

গবাদিপশুর উচ্ছিষ্ট খড়কুটা থেকে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যায়। কম্পোস্ট অর্থ মোটামুটি অপচনশীল ও দূর্গন্ধহীন জৈব পদার্থ যা বায়ুর উপস্থিতিতে উত্তাপ সৃষ্টির মাধ্যমে এক বা একাধিক জৈব পদার্থের মিশ্রণ পচনের পর উৎপন্ন হয়। কম্পোস্ট (দযলসষড়ঢ়) ল্যাটিন শব্দ। গরু-বাছুরের উচ্ছিষ্ট খাবারের সঙ্গে আগাছা, কচুরিপানা, শস্যের অবশিষ্টাংশ মিশ্রিত করে কয়েকটি স্তরে সাজিয়ে পচানো হয়। কম্পোস্ট সার জমিতে আদর্শ জৈব পদার্থ যোগ করে। শাকশবজি ও ফলের চারা জন্মানোর জন্যেই এ সার বীজতলায় ব্যবহার করা অপরিহার্য।

গ্রামে জ্বালানি কাজে ব্যাপকভাবে শুকনো গোবর ব্যবহার করা হয়।

জ্বালানি কাজে শুকনো গোবরের ব্যবহার

শুকনো গোবর আমাদের গ্রাম বাংলায় কৃষকের ঘরে উত্তম জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এদেশের গরীব কৃষক সম্প্রদায় নিতান্ত অভাবী। কেরোসিন কিংবা কাঠ কেনার মতো সঙ্গতি তাদের নেই। অথচ কৃষকের বাড়িতে কৃষির আনুসাঙ্গিক কাজ, যেমন- ধান সিদ্ধ, মুড়ি বা খই ভাজা প্রভৃতিতে প্রচুর জ্বালানির প্রয়োজন। সাধারণত শুকনো গোবর, গাছের শুকনো ডালপালা দিয়ে তারা জ্বালানির কাজ চালায়। এছাড়াও গরুর গোবর থেকে বায়োগ্যাস তৈরি করে জ্বালানি হিসেবে এবং অবশিষ্ট গোবর সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

এখানে ধান মাড়াই, আখ মাড়াই, ঘানি টানা প্রভৃতি কৃষিকাজে পশুশক্তির ব্যবহার সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

গরুর সাহায্যে ধান মাড়াই করা হয়।

ধান মাড়াই

ধান মাড়াইয়ের কাজেও পশুশক্তি ব্যবহৃত হয়। গাছ থেকে ধান ছাড়ানোকে ধান মাড়াই বলে। ধান মাড়াই কাজে একত্রে অনেকগুলো গরু ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে মাঠে ধানগাছগুলো হাত দিয়ে ছাড়িয়ে ধানগাছের বিছানা তৈরি করা হয়। বিছানো ধানের মাঝখানে একটি গরু রাখা হয়। ঐ গরুটির সংগে আরও গরু সারিবদ্ধভাবে বেঁধে ছড়ানো ধানের উপর ঘোরানো হয়। মাঝখানের গরুটি আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকে এবং সবগুলো গরুকে চক্রাকারে ঘুরতে সাহায্য করে। গরুর পা দিয়ে দলিত মথিত হয়ে গাছ থেকে ধান আলাদা হয়ে আসে।

চিত্র ৪ ঃ গবাদিপশু দিয়ে ধান মাড়াই

আখ মাড়াই

আমাদের দেশের বহু কৃষক আখ চাষ করেন। আখ থেকে গুড়ও উৎপাদন করেন, বিশেষ করে যেসব এলাকায় চিনির কল নেই। আখ থেকে রস বের করার পদ্ধতিকে আখ মাড়াই বলে। আখ মাড়াইয়ের কাজে গবাদিপশু ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ৫ ঃ গবাদিপশু দিয়ে আখ মাড়াই

ঘানি টানা

এদেশের কৃষকদের মধ্যে কলু নামে এক সম্প্রদায় আছে যারা তেলবীজ থেকে তেল উৎপাদন করেন। সরিষা, তিল বা নারিকেল থেকে তেল উৎপাদন করার জন্য ঘানি টানার কাজে গবাদিপশু ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ৬ ঃ গবাদিপশু দিয়ে ঘানি টানা

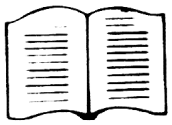

সারমর্ম ঃ আমরা সকলেই জানি বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশে কৃষির প্রধান অবলম্বন গবাদিপশু। কৃষি এবং কৃষি সম্পর্কিত কাজ, যেমন- হালচাষ, ধান মাড়াই, আখ মাড়াই, ঘাটি টানা, পরিবহণ, ক্ষেত নিড়ানি প্রভৃতি কাজে গবাদিপশু ব্যবহৃত হয়। এদেশে কৃষিকাজে পুরোপুরি যন্ত্রের ব্যবহার এখনও সম্ভব হয় নি। তাই বাংলাদেশের কৃষিকাজে পশুর ব্যবহারই প্রধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বাংলাদেশে হালের গরুর সংখ্যা কত?
- ক) ১০.৮২ মিলিয়ন
- খ) ৫.৮২ মিলিয়ন
- গ) ৯.৫২ মিলিয়ন
- ঘ) ৮.৭৫ মিলিয়ন

২। এদেশে কৃষিভূমি চাষের জন্য কত মেগাওয়াট শক্তির প্রয়োজন?
- ক) ৪৯৪২.৩ মিলিয়ন মেগাওয়াট
- খ) ৪৯১২.৩ মিলিয়ন মেগাওয়াট
- গ) ৪৯৫২.৩ মিলিয়ন মেগাওয়াট
- ঘ) ৪৯৩২.৩ মিলিয়ন মেগাওয়াট

৩। গোবরে নাইট্রোজেন ও পটাশিয়ামের পরিমাণ যথাক্রমে কত?
- ক) ১.৫০-২.১০% ও ০.৭০-০.৮০%
- খ) ১.৪০-২.০০% ও ০.৭০-০.৮০%
- গ) ১.২০-১.৮০% ও ০.৫০-০.৭০%
- ঘ) ১.৪০-২.০০% ও ০.৬০-০.৭০%

৪। এদেশে সরিষা তেলবীজ থেকে যারা তেল উৎপাদন করেন তাদের কী বলে?
- ক) তাতী
- খ) গোয়ালা
- গ) ধোপা
- ঘ) কলু

পাঠ ১.৩ খাদ্য উৎপাদনে পশুর গুরুত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি-

- দুধ ও মাংসের গুণাগুণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- দুধ ও মাংস উৎপাদনে গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরতে পারবেন।
- আমিষের ঘাটতি পূরণে আমাদের কী করণীয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও দেহ গঠনের জন্য আমিষজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। দুধ ও মাংস আমিষজাতীয় খাদ্য। দুধ ও মাংস আমরা গৃহপালিত পশু থেকে পেয়ে থাকি। তবে, হাঁসমুরগিও আমাদের আমিষসমৃদ্ধ ডিম ও মাংস সরবরাহ করে থাকে।

দুধের সংজ্ঞা

এক বা একাধিক দুগ্ধবতী গাভীর ওলান গ্রন্থির সম্পূর্ণ দোহনের ফলে যে তরল পদার্থ পাওয়া যায় এবং যাতে কমপক্ষে ৩.৪% চর্বি এবং চর্বি ছাড়া অন্যান্য খাদ্যোপাদান ও খনিজ পদার্থ কমপক্ষে ৮.২% বিদ্যমান থাকে, তাকে দুধ বলে।

দুধ আদর্শ খাদ্য। শালদুধে রোগপ্রতিরোধক অ্যান্টিবডি থাকে।

দুধের গুণাগুণ

দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয়। বাচ্চা প্রসবের পর থেকে ৩-৪ দিন পর্যন্ত উৎপন্ন পশুর দুধকে শালদুধ বা কলস্ট্রাম বলে। এতে খণিজপদার্থ, ভিটামিন-এ ও রোগপ্রতিরোধক অ্যান্টিবডি থাকে। স্বাভাবিক দুধের তুলনায় কলস্ট্রামে আমিষের পরিমাণ ৩-৫ গুণ, চর্বি প্রায় দ্বিগুণ এবং খণিজপদার্থ ও ভিটামিন অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। তবে, বাচ্চা জন্ম হওয়ার পর সময়ের সাথে কলস্ট্রামের গঠন পরিবর্তিত হয়। এই দুধ পানে বাচ্চার পেটে জমে থাকা মল বের হয়ে যায়। খাবারে রুচি আসে। মানুষ বা পশুর বাচ্চার শরীর ঠিকমতো বৃদ্ধির জন্য যেসব অতি প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড দরকার সেগুলোসহ দুধের আমিষে সব ধরনের অ্যামাইনো এসিডই আছে। উদ্ভিদ আমিষে লাইসিন, মিথিওনিন ও সিস্টিনের অভাব রয়েছে বিধায় বাচ্চাদের সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত দুধ পান করানো উচিত। অনুরূপভাবে, দুধের চর্বিতে অতি প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিডসহ (লিনোলিক ও লিনোলেনিক এসিড) অন্যান্য ফ্যাটি এসিডগুলোও আছে। গৃহপালিত পশুর মধ্যে আমাদের দেশে দুধের জন্য গাভী, ছাগল ও মহিষ প্রসিদ্ধ। এসব পশুর দুধের মধ্যে সামান্য তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও একই প্রজাতির পশুর, এমনকি, বয়সভেদে একই পশুর দুধের গঠনে তারতম্য দেখা যায়। এখানে গাভীর কলস্ট্রাম ও দুধ এবং বিভিন্ন পশুর দুধের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

সারণি ৬ ঃ গাভীর কলস্ট্রাম, দুধ এবং বিভিন্ন পশুর দুধে উপস্থিত পুষ্টি উপাদানসমূহের হার

গাভীর কলস্ট্রাম/ বিভিন্ন পশুর দুধ	শুষ্ক পদার্থ (%)	আমিষ (%)	চর্বি (%)	শর্করা (%)	খণিজ ও অন্যান্য দ্রব্য (%)	পানি (%)
গাভীর কলস্ট্রাম	২৫.৯	১৭.৬	৫.১	২.২	১.০	৭৪.১
গাভীর দুধ	১২.৬	৩.৪	৩.৭	৪.৮	০.৭	৮৭.৪
ছাগলের দুধ	১৪.৩	৩.৭	৪.৮	৫.০	০.৮	৮৫.৭
মহিষের দুধ	১৫.৮	৩.৭	৬.৫	৪.৮	০.৮	৮৪.২

গবাদিপশুর দুধ থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা যায়।

দুধ উৎপাদনে পশুর গুরুত্ব

স্তন্যপায়ী প্রাণী বাচ্চা প্রসবের পর স্তন গ্রন্থি থেকে দুধ নিঃসরন করে। সাধারণত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উটের দুধ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে, আমাদের দেশে প্রধানত গরু, মহিষ ও ছাগলের দুধই খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

দুধ উৎপাদনে গাভীর গুরুত্ব

- গাভীকে মানব জাতির দুগ্ধমাতা বলা হয়। গোসম্পদসমৃদ্ধ দেশে জৈব আমিষের এক-তৃতীয়াংশ সংগৃহীত হয় গাভীর দুধ থেকে।

- গাভীর দুধের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক। গাভীর দুধ থেকে পনির, মাখন, ঘি, কেক, বিস্কুট, পুডিং, মিষ্টি, সন্দেশ, পায়েশ এবং আরও বহুবিধ সুস্বাদু খাবার তৈরি করে ব্যবসা করা যায়। তাতে জীবিকা নির্বাহ ও কর্মসংস্থানের পথ হয়।
- গুঁড়ো দুধ, চকোলেট ও শুষ্ক মিষ্টি খাবার রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।

দুধের ঘাটতি মেটাতে বাংলাদেশে দুধ আমদানির একটি প্রতিবেদন এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৭ ঃ বাংলাদেশ কর্তৃক গুড়া দুধ আমদানি (১৯৮৫-৬৬ থেকে ১৯৮৯-৯০ সাল)

বৎসর	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (মিলিয়ন টাকা)
১৯৮৫-'৮৬	৫৪৮২১	১৮২৮
১৯৮৬-'৮৭	৫৯৬৪০	২০৬৭
১৯৮৭-'৮৮	৫৬০০০	২১২০
১৯৮৮-'৮৯	৭০০০০	৩২০০
১৯৮৯-'৯০	৬৫০০০	৪৫০০
১৯৯৪-'৯৫	-	১৪০০

উৎস ঃ প্ল্যানিং সেকশান, মিল্ক ভিটা, ঢাকা।

দুধ উৎপাদনে ছাগলের গুরুত্ব

- ছাগলের দুধের চর্বি কণা ছোট বলে সহজপাচ্য; বৃদ্ধ ও রোগীদের জন্য বিশেষ উপকারী।
- ছাগল বাংলাদেশে গরীবের গাভী হিসেবে পরিচিত। দুঃস্থ মহিলা, বিত্তহীন, ভূমিহীন ও যাদের গাভী কেনার ক্ষমতা নেই তারা ছাগল পালন করে দুধের প্রয়োজন মেটায় অথবা দুধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে।
- ছাগলের দুধের উৎপাদন খরচ কম হয়।

দুধ উৎপাদনে মহিষের গুরুত্ব

- মহিষের দুধে গরুর দুধ অপেক্ষা পানির পরিমাণ কম এবং চর্বির পরিমাণ বেশি। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য মহিষের দুধ থেকে ঘি, দধি, মাখন, পনির প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়।
- ভারত ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য দেশে মহিষের দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও বিপনন ব্যবস্থার জন্য কোনো স্বীকৃত মানদন্ড নেই।

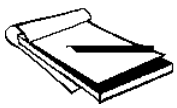

অনুশীলন (Activity) ঃ *গরু, ছাগল ও মহিষের দুধের গুণাগুণ ভালোভাবে পড়ে খাতায় এগুলোর একটি পার্থক্যসূচক সারণি তৈরি করুন।*

ক্ষুধা নিবৃত্তি ছাড়াও মাংস দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও দেহ গঠনে সহায়তা করে।

মাংস উৎপাদনে পশুর গুরুত্ব

প্রাচীনকাল থেকেই পশুর মাংস মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আদিম গুহাবাসী মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যেসব খাদ্য গ্রহণ করত তার মধ্যে মাংসই প্রধান ছিল। তারা অবশ্য ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মাংস ভক্ষন করত। এ যুগে ক্ষুধা নিবৃত্তি ছাড়াও মাংসের পুষ্টিগুণের জন্য খাদ্য হিসেবে এটি গ্রহণ করা হয়। এটি উৎকৃষ্ট আমিষ ও খেতে সুস্বাদু যা দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও দেহ গঠনে সহায়তা করে। মাংস থেকে নানাবিধ মজাদার খাবার, যেমন- চপ, কাটলেট, কাবাব, রোস্ট প্রভৃতি তৈরি করা যায়।

মাংসের গুণাবলী

- টাটকা মাংসে ১৫-২০% আমিষ থাকে।
- এতে অতি প্রয়োজনীয় সকল অ্যামাইনো এসিড বিদ্যমান।
- মাংসের সঙ্গে লাগানো চর্বি শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে।

- মাংস খণিজপদার্থের উৎস। এতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস প্রচুর পরিমাণে থাকে যা দাঁত গঠনে সহায়ক কোষের অভ্যন্তরে ঢুকে তাতে রক্তের ক্ষারতা স্থিতিশীল করে এবং স্নায়ুশক্তি যোগায়। মাংসে লোহা থাকে যা রক্তশূন্যতা দূর করে। ভিটামিনের মধ্যে থায়ামিন, ভিটামিন-বি$_{১২}$ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে থাকে বলে মাংসকে ভিটামিন-বি কমপ্লেক্সের উৎস বলে।

সারণি ৮ ঃ বিভিন্ন প্রজাতির পশুর মাংস ও দুধে পুষ্টির পরিমাণ

খাদ্যের নাম	প্রতি ১০০ গ্রামে পুষ্টির পরিমাণ			
	শক্তি (কিলোক্যালরি)	আমিষ (%)	চর্বি (%)	শর্করা (%)
গোমহিষের মাংস (আননপ)	১১৪.০	২২.৬	২.৬	--
ছাগলভেড়ার মাংস (খয়ঢ়ঢ়যশ)	১১৮.০	২১.৪	৩.৬	--
দুধ (খভরয)	৬৭.০	৩.২	৪.১	৪.৪

এদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস অতি উন্নতমানের।

মাংস উৎপাদনে ছাগলের গুরুত্ব

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। ছাগলের মাংসকে ইংরেজিতে চিভন (Cheavon) বলে। এদেশে ছাগলের মাংসের চাহিদা খুব বেশি। সারাদেশে প্রতিদিন বহু ছাগল জবাই হয়। ছাগলের মাংস বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এ ছাগলের মাংসের বেশ চাহিদা রয়েছে। ছাগলের মাংস সংরক্ষিত অবস্থায় বিদেশে অনায়াসে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে আমাদের দেশে এ ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধির হার কম। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দিয়ে এদেশের মাংসের চাহিদা মেটানো খুব সহজ কারণ এরা প্রতিবারে ২-৪টি বাচ্চা দিতে সক্ষম। কম ব্যয়ে উত্তম মাংস পেতে হলে ছাগল পালন করা উচিত। এদের পালনে খরচ কম অথচ লাভ বেশি। আমিষের চাহিদা মেটাতে ছাগলের গুরুত্ব অপরিসীম।

মাংস উৎপাদনে গরুর গুরুত্ব

পৃথিবীর বহু দেশে গোমাংস প্রিয় খাদ্য। গরুর মাংসকে ইংরেজিতে বিফ (Beef) বলে। গোমাংস থেকে চপ, কাবাব, কাটলেট, বার্গার এবং আরও নানা ধরনের খাবার তৈরি হয়। মুসলিম দেশগুলোতে যে কোনো ভোজে গোমাংসের ভূনা আলাদা মর্যাদা লাভ করেছে। আজকাল শুকনো ও দুর্বল ষাঁড়কে ৩-৪ মাস ভালো খাদ্য খাইয়ে মোটাতাজা করা হয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল জনবহুল দেশে এ কর্মকান্ড আমিষ ঘাটতি পূরণে বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

মাংস উৎপাদনে ভেড়ার গুরুত্ব

ভেড়ার মাংসও সুস্বাদু। ভেড়ার মাংসকে ইংরেজিতে মাটন (Mutton) বলে। ভেড়া ছাগলের তুলনায় নিম্নমানের খাদ্য খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে। কম খরচে সহজে ভেড়া পালন করা যায়। মাংসের চাহিদা মেটাতে ভেড়ার ভূমিকাও কম নয়। ভেড়া পালন করলে মাংসের জন্য ছাগলের উপর চাপ কমবে। তাই আমিষের চাহিদা পূরণ করতে ভেড়ার গুরুত্বও কম নয়।

মাংস উৎপাদনে মহিষের গুরুত্ব

অন্যান্য গৃহপালিত পশু অপেক্ষা মহিষ বড় আকারের প্রাণী। সেজন্য পশুপ্রতি মাংস উৎপাদনে মহিষের স্থান সবার উপরে। মহিষের মাংসকে ইংরেজিতে বুফেন (Buffen) বলে। ২৪ মাসের কম বয়সের মহিষের মাংস গরুর মাংসের মতোই সুস্বাদু। এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠির আমিষের চাহিদা মেটাতে তাই গরুর পাশাপাশি মহিষের মাংস উৎপাদন ও ব্যবহারে পদক্ষেপ নেয়া উচিত। বর্তমানে আমাদের দেশের শতকরা ৮০% লোক আমিষের অভাবজনিত রোগে ভূগছে। অন্যান্য গৃহপালিত পশুর সাথে মহিষের সংখ্যা বাড়িয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মাংস খাওয়ার প্রচলন করতে পারলে এদেশের আমিষের চাহিদা পূরণে সাহায্য হবে। মহিষ পালনে বিশেষ কিছু সুবিধাও আছে। যেমন- প্রতিকূল পরিবেশে এরা বেঁচে থাকতে পারে, এদের রোগবালাই কম হয়, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, গরুর তুলনায় নিম্নমানের খাদ্য খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে। উন্নত খাদ্য প্রদান করলে অনুকূল পরিবেশে ৮-৯ মাস বয়সের মহিষের বাছুর দৈনিক এক কেজি পরিমাণ দৈহিক ওজন বৃদ্ধি করতে পারে।

প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান

আমাদের দেশে প্রাণিজ আমিষের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এদেশে জনপ্রতি দৈনিক কমপক্ষে ৬২ গ্রাম প্রাণিজ আমিষ খাওয়া উচিত। অথচ আমরা পাচ্ছি মাত্র ৪.৯ গ্রাম যার মধ্যে পশুপাখি থেকে আসে মাত্র ১.৮ গ্রাম। প্রাণিজ আমিষের এ ঘাটতির কারণে বহু শিশু অপুষ্টিজনিত রোগে ভূগছে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর বিদেশ থেকে ৬০-৭০ হাজার মেট্রিক টন গুড়ো দুধ আমদানি করা হয়েছে। অবশ্য ইতোমধ্যেই দেশে বেসরকারীভাবে দুগ্ধ খামার গড়ে ওঠায় ১৯৯৫ সালে আমদানির পরিমাণ প্রায় ৭০% কমে গেছে। তবে গুঁড়ো দুধ আমদানি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হওয়া উচিত। এজন্য খামারের সংখ্যা ও উৎপাদন আরও বাড়ানো প্রয়োজন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ১৯৮৫ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে আমাদের দেশের সঙ্গে উন্নত দেশের জনপ্রতি আমিষের প্রাপ্যতার একটি আনুপাতিক হিসাব এখানে দেখানো হয়েছে।

দৈনিক জনপ্রতি ৬২ গ্রাম প্রাণিজ আমিষের প্রয়োজন হলেও পশুপাখি থেকে বর্তমানে পাচ্ছি মাত্র ১.৮ গ্রাম।

সারণি ৯ ঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনপ্রতি আমিষের প্রাপ্যতার হার

দেশের নাম	দৈনিক জনপ্রতি প্রয়োজনীয় মোট আমিষ (গ্রাম)	দৈনিক জনপ্রতি প্রাপ্ত প্রাণিজ আমিষ (গ্রাম)
বাংলাদেশ	৪০.৩	৪.৯০
ভারত	৫০.৮	৫.৮০
জাপান	৯২.৩	৫০.৬
আমেরিকা	১০৬.০	৭১.০

উৎস ঃ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, ১৯৮৫।

বাংলাদেশে আমিষের ঘাটতি পূরণে আমাদের করণীয়

বাংলাদেশে আমিষের ঘাটতি পূরণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই পালন করতে হবে। যথা-

- দুধ ও মাংস খামার ব্যবসাকে লাভজনক হারে বাড়ানোর জন্য সরকারী নীতি নির্ধারণ করতে হবে।
- দেশে অধিক উৎপাদনশীল গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- সনাতন পদ্ধতিতে পশুপালন বর্জন করতে হবে।
- আধুনিক পশুপালন পদ্ধতি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে হবে।
- অধিকাংশ গৃহপালিত পশুর বেলায় গরু মোটাতাজাকরণ পদ্ধতির মতো কর্মকান্ড অনুসরণ করতে হবে।
- দেশের বেকার যুবকদের উন্নত পদ্ধতিতে পশুসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- ভেড়া ও মহিষের মাংসের গ্রেডেশন করে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- দুধ ও মাংস সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের সরকারী নীতিমালা প্রনয়ণ করতে হবে।
- পশুসম্পদ গবেষণা কর্মসূচি আরও জোরদার করতে হবে।
- পশুসম্পদ বিজ্ঞান সর্বস্তরে বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- পশুপাখির খাদ্য ও চিকিৎসার সুযোগ বাড়াতে হবে।
- পশুসম্পদ উন্নয়নে সরকারের বিনিয়োগ আরও বাড়াতে হবে।
- ব্যাংক ঋণের প্রাপ্যতা সহজ করতে হবে।

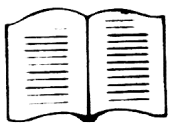

সারমর্ম ঃ খাদ্য উৎপাদনে গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, দুধ ও মাংস পৃথিবীর সব মানুষেরই অন্যতম প্রধান খাদ্য যা ছাগল, গরু, মহিষ, ভেড়া তথা গৃহপালিত পশু থেকেই পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আমিষজাতীয় খাদ্যের অভাব প্রকট। এই অভাব দূরীকরণের জন্য গৃহপালিত পশুপালনে আমাদেরকে যত্নশীল হতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন পশুপালনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। উদ্ভিদ আমিষে কোন্ অ্যামাইনো এসিডের অভাব রয়েছে?
- ক) লাইসিন ও সিস্টিন
- খ) লাইসিন, মিথিওনিন ও সিস্টিন
- গ) গ্লাইসিন ও হিস্টিডিন
- ঘ) হিস্টিডিন ও লাইসিন

২। দুধের চর্বির প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড দুটোর নাম কী?
- ক) লিনোলিক ও লিনোলেনিক এসিড
- খ) লিনোলিক ও অ্যাস্করবিক এসিড
- গ) সাইট্রিক ও অ্যাস্করবিক এসিড
- ঘ) লিনোলেনিক ও সাইট্রিক এসিড

৩। টাটকা মাংসে কত % আমিষ থাকে?
- ক) ১৫-২০%
- খ) ১০-১৪%
- গ) ১৫-২৫%
- ঘ) ২০-২২%

৪। কোন্ বয়সের মহিষের মাংস গরুর মতোই সুস্বাদু?
- ক) ১২ মাসের বেশি বয়সের
- খ) ১৮ মাস বয়সের
- গ) ২৪ মাসের কম বয়সের
- ঘ) ৩০ মাস বয়সের

৫। বাংলাদেশে জনপ্রতি দৈনিক আমিষ প্রাপ্যতার পরিমাণ কত?
- ক) ৫.৮০ গ্রাম
- খ) ৪.৯০ গ্রাম
- গ) ৭.৮০ গ্রাম
- ঘ) ৬.৫০ গ্রাম

পাঠ ১.৪ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুর গুরুত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অর্থ বলতে পারবেন।
- গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির নাম এবং এসব দ্রব্যাদি রপ্তানি করে বাংলাদেশ কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে তা বলতে পারবেন।
- গবাদিপশু থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশ কেন পিছিয়ে আছে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গবাদিপশু থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে ও এ মুদ্রা অর্জনে আমাদের দেশে কী সুবিধা আছে তা তুলে ধরতে পারবেন।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গবাদিপশুর বেশ গুরুত্ব রয়েছে। একটি দেশের পণ্যদ্রব্য অন্যদেশে রপ্তানি করে যে মুদ্রা অর্জন করা হয় তাকে বৈদেশিক মুদ্রা বলে। সাধারণত নিজের দেশের চাহিদা মেটানোর পর বাড়তি অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। গৃহপালিত পশু এমন এক সম্পদ যা থেকে যে কোনো দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। এজন্য প্রয়োজন হয় শুধু এ সম্পদের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার। উন্নত দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় তারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে পশুপালন করে পশুজাত দ্রব্যের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি অংশ বিদেশে রপ্তানি করছে। এভাবে তারা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। যে দেশ যত বেশি আকর্ষণীয় ও উন্নতমানের এবং অধিক হারে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে পারছে বিশ্ববাজার থেকে সে দেশ তত বেশি মুদ্রা অর্জন করতে পারছে।

গবাদিপশু থেকে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় যা রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।

গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী

গবাদিপশুর উপজাত দ্রব্য থেকে নিম্নলিখিত রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে তা থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। যথা-

- সংরক্ষিত দুধ ও মাংস।
- ভেড়ার পশম থেকে উত্তম শীতবস্ত্র তৈরি হয়। ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভেড়ার পশম থেকে উত্তম কাপড় তৈরি করে যা পৃথিবীর সর্বত্রই রপ্তানি হয়। তবে, আমাদের দেশের ভেড়ার পশম নিম্নমানের হওয়ায় এ থেকে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হয় না।
- পশুর চামড়া থেকে ভ্যানেটি ব্যাগ, আসবাব পত্র, বাদ্যযন্ত্র, খেলনা, সৌখিন দ্রব্য ছাড়াও অসংখ্য দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা হয়।
- শিং, খুর ও হাড় থেকে জিলাটিন, আঠা, গহনা, চিরুনি, বোতাম, ছাতা ও ছুরির বাট, হাড়ের গুড়া থেকে সার প্রভৃতি তৈরি করা যায়।
- পশুর রক্তে খণিজপদার্থ, হরমোন ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান থাকে। রক্ত সংগ্রহ করে শুকিয়ে মানুষ ও পশুর খাদ্য তৈরি করা যায়। রক্ত থেকে কোলাজেন তৈরি করা হয়।
- পশুর ক্ষুদ্রান্ত থেকে সার্জিক্যাল সুতো, টেনিস র‍্যাকেট স্ট্রিং, মিউজিক্যাল স্ট্রিং প্রভৃতি তৈরি হয়।
- দাঁত দিয়ে বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি তৈরি করা যায়।
- চর্বি থেকে মোমবাতি, গ্লিসারিন, সাবান, লুব্রিক্যাটিং তেল, সিনথেটিক রাবার ও প্লাস্টিক তৈরি হয়।
- অগ্নাশয় (ঙতশদক্ষনতড়) থেকে ইনসুলিন তৈরি হয়।
- এড্রেনাল গ্রন্থি (অধক্ষনশতর ফরতশধ) থেকে ওষুধ তৈরি হয়।
- পশুর চুল থেকে ব্রাশ, বস্ত্র, কৃত্রিম চুল প্রভৃতি তৈরি করা হয়।

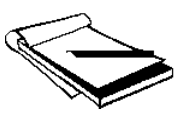

অনুশীলন (Activity) ঃ *গবাদিপশু উপজাত থেকে উৎপাদিত রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা তৈরি করে টিউটরকে দেখান।*

অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ দুধ, মাংস ও উপজাত দ্রব্য থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বহু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এশিয়ার মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া মাংস ও দুধ মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি করছে।

চামড়া রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর ৫০০ মিলিয়ন টাকা উপার্জন করে।

পশুসম্পদ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ একবার টাটকা ও ড্রেসড মাংস বিদেশে রপ্তানি করেছিল যা নানা কারণে বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৫১১৫ টন পশুর হাড় উৎপাদিত হচ্ছে। বেক্সিমকো কোম্পানি ১৯৯০ সালে ১৮৯৪ টন হাড়ের গুড়া রপ্তানি করে ১০.৭১ মিলিয়ন টাকা উপার্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় বিশটির মতো হাড় গুড়া করার কারখানা রয়েছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ বিদেশে চামড়া রপ্তানি করছে। চামড়া উৎপাদনের ৮১% ওয়েট ব্লু (Wet blue) বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৯৯০ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশ চামড়া রপ্তানি করে ৫৩৭৮ মিলিয়ন টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। সে সময় রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চামড়া তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। বাংলাদেশ শুধু চামড়া থেকেই প্রতিবছর ৫০০ মিলিয়ন টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে।

চিত্র ৭ ঃ চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দরের মাধ্যমে পশুর চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশ কেন পিছিয়ে

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিদেশের তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এর কারণগুলো সংক্ষেপে এখানে দেয়া হয়েছে। যথা-

- পশুসম্পদ উন্নয়নে সরকারের নীতি প্রনয়ণে মন্থর গতি ও স্বল্প বিনিয়োগ।
- মানুষ শহরমুখী হওয়ায় পশুপালনে অনীহা দেখা দিয়েছে।
- পশুসম্পদ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য উপযুক্ত বাজার ব্যবস্থার অভাব।
- লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় চারণভূমি কমে গেছে।
- পশু খাদ্যের অভাব ও দরিদ্রতার কারণে পশুপালনের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে গেছে।
- বাস্তবমুখী গবেষণার অভাব, গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে নানা ধরনের বাধা, যেমন- অর্থাভাব, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, উৎসাহের অভাব, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি।
- পশু ও পশুজাত দ্রব্যের সঠিক মূল্যমান নির্ধারণ না করায় পশু ব্যবসায়িদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি।
- বৈজ্ঞানিক উপায়ে পশুর উপজাত দ্রব্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাব।
- পশু উপজাত দ্রব্য ব্যবহারের উপর গবেষণার অভাব।
- শস্য উপজাতসহ অন্যান্য পশুখাদ্য রপ্তানি করা।

বাংলাদেশের গবাদিপশু থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার উপায়

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়ার প্রচুর চাহিদা। কাজেই এর উৎপাদন বাড়িয়ে অধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। দুধ উৎপাদন বাড়িয়ে তা থেকে দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য, যেমন- মিষ্টি, সন্দেশ, কেক, বিস্কুট, চকোলেট তৈরি করে রপ্তানি করা যেতে পারে। মাংস থেকে উৎপাদিত খাদ্য ও সংরক্ষিত মাংস রপ্তানি করা যায়।

চিত্র ৮ ঃ গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যাদি

মহিলা ও বেকার জনগোষ্ঠিকে পশু উপজাত দ্রব্যসামগ্রী তৈরিতে নিয়োজিত করা

বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যেমন- খেলনা, গহনা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি করা যায়। এসব কাজে এদেশের কুমার, স্বর্ণকার, কাঠ মিস্ত্রি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক নিয়োজিত করলে সুন্দর ও নতুন ধরনের রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। কারণ, এরা এসব কাজে সুনিপুণ ও দক্ষ কারিগর। মহিলা ও বেকার ব্যক্তিদের দিয়ে কুটির শিল্প কাজ, যেমন- ভেড়ার পশম থেকে কার্পেট, মোটা কম্বল প্রভৃতি তৈরিতে লাগানো যায়। তাছাড়া আমাদের দেশের ভেড়ার জাত উন্নয়ন করে উত্তম পশম উৎপাদন করা যেতে পারে যা রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশের সুবিধা

- বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে কর্মশক্তিতে বিভিন্নমুখী কর্মে নিয়োগ করা যায়।
- কৃষিনির্ভর অর্থনীতির কারণে শস্য উপজাত সহজেই গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- কম মূল্যে শ্রমিক পাওয়া যায়।

সারমর্ম ঃ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গৃহপালিত পশু অন্যতম সম্পদ। গৃহপালিত পশু থেকে প্রাপ্ত দুধ ও মাংস এবং উপজাত দ্রব্য থেকে প্রস্তুত ব্যবহার্য্য দ্রব্য বিশ্ববাজারে বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। তবে, পণ্যদ্রব্যগুলো অবশ্যই আকর্ষনীয়, উন্নত মানসম্পন্ন এবং দামে সস্তা হতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সুফল পাওয়া যাবে। কারণ, আমাদের বিপুল জনশক্তি ও পশুপালনের অনুকুল পরিবেশ আছে। এখন শুধু প্রয়োজন এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। পশুর ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে কী তৈরি করা যায়?
- ক) মিউজিক্যাল স্ট্রিং
- খ) চিরুনি
- গ) বোতাম
- ঘ) ওষুধ

২। গবাদিপশুর অগ্নাশয় থেকে কী তৈরি করা যায়?
- ক) ওষুধ
- খ) চাকুর বাট
- গ) ইনসুলিন
- ঘ) জ্যাকেট

৩। বাংলাদেশ চামড়া রপ্তানি করে প্রতিবছর গড়ে কত টাকা উপার্জন করে?
- ক) ৫০০ মিলিয়ন টাকা
- খ) ৪০০ মিলিয়ন টাকা
- গ) ১০০ মিলিয়ন টাকা
- ঘ) ৭০০ মিলিয়ন টাকা

৪। বাংলাদেশ গবাদিপশুর উপজাত দ্রব্য থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এত পিছিয়ে কেন?
- ক) গবেষণার অভাব
- খ) ব্যবস্থাপনার অভাব
- গ) লোকসংখ্যার অভাব
- ঘ) পশুসম্পদের অভাব

পাঠ ১.৫ দারিদ্র দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানে পশুর গুরুত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি-

- আত্মকর্মসংস্থানের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে বিভিন্ন যুগে গবাদিপশু কতটুকু ভূমিকা রেখেছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে গবাদিপশুর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে পশু উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে পশুকেন্দ্রিক কর্মসূচি বলতে পারবেন।

আত্মকর্মসংস্থান

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান এক নয়। জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করার সুযোগকে কর্মসংস্থান বলে। আর নিজের চেষ্টায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে কর্মে আত্মনিয়োগ করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। আত্মকর্মসংস্থান মানুষের চাহিদা মিটিয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন করে বলে এটি মানুষের দারিদ্র দূরীকরণে সহায়তা করে। পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর মানুষকে প্রথম কর্মসংস্থানের সন্ধান দিয়েছিল পশু। তারপর পর্যায়ক্রমে বুদ্ধি বিকাশের সাথে সাথে পশুকে কেন্দ্র করে মানুষ নিজে নিজে বিভিন্নমুখী আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। মূলে ছিল মানুষের আত্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন আর পশুর অবদান। পশু মানুষকে প্রয়োজনভিত্তিক চাহিদা মেটানো ছাড়াও প্রয়োজনোতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের পথ দেখিয়ে দারিদ্র দূরীকরণে যুগে যুগে ভূমিকা পালন করে এসেছে। সুতরাং আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণের পূর্ব ইতিহাস উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দরিদ্রতা দূর করা যায়।

আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে বিভিন্ন যুগে পশুর ভূমিকা

বর্বর যুগে মানবজাতি সভ্য ছিল না। পশুর সঙ্গে একসাথে বাস করত। পশুর মাংস ভক্ষন করে ক্ষুধা নিবারণ করত। চামড়া পরিধান করে লজ্জা নিবারণ করত। তাই তারা পশু শিকার করার জন্য জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। শিকার করার জন্য নানা রকমের যন্ত্র বানাত। এভাবে মানব জাতির প্রথম আত্মকর্মসংস্থানের উদ্ভব হয়েছিল যাকে শিকার করা বলে। সেকালে যারা শিকার ধরতে পারত তাদের খাওয়াপরার চাহিদা মিটে যেত, ফলে তাদের আর অভাব থাকত না অর্থাৎ দারিদ্র দূর হতো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাচীনকালেও পশু মানুষের দারিদ্র দূরীকরণে প্রথম স্থানে ছিল।

আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে বিভিন্ন যুগেই পশুর অবদান ছিল।

মানুষ যখন কিছুটা সভ্য হলো, আবাসস্থল গড়ে তুললো। গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল পালন করতে শুরু করল। মাঠে পশু চরানোর জন্য রাখাল নিয়োগ করল। এমনিভাবে রাখালি পেশার উদ্ভব হলো। আজও ভারত, বাংলাদেশের গ্রামে বহু ছেলে এ পেশায় জীবিকা নির্বাহ করছে।

চিত্র ৯ ঃ রাখাল গরু নিয়ে মাঠে যাচ্ছে

পরবর্তীকালে সময়ের সাথে সাথে কৃষি, পরিবহণ, খাদ্য উৎপাদন প্রভৃতি কাজে পশুর ব্যবহার আরও বিস্তার লাভ করল। পশুকেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের পেশার উদ্ভব হলো। বিভিন্ন পেশাবলম্বী মানুষ বিভিন্ন

শ্রেণীতে বিভক্ত হলো, যেমন- গোয়ালা, কলু, কৃষক, গাড়োয়ান, ময়রা প্রভৃতি। এদের মধ্যে দুধ বিক্রির পেশা যারা বেছে নিলো তাদের গোয়ালা, পশুর গাড়ি চালকদের গাড়োয়ান, গরু দিয়ে ঘানি থেকে তেল উৎপাদন ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের কলু, আর ফসল ফলানো যাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় হলো তারা কৃষক বলে সমাজে পরিচিত হলো। এসব পেশার প্রত্যেকটির সঙ্গেই পশুর সম্পর্ক রয়েছে।

চিত্র ১০ ঃ গোয়ালা দুধ নিয়ে বাজারে যাচ্ছে

এরপর এল বিজ্ঞান ও শিল্প যুগ। আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে পশুর ভূমিকা আরও ব্যাপক হলো। শিল্পোন্নত দেশ, যেমন- ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পশুসম্পদের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাটালো। ফলে তারা প্রয়োজনোতিরিক্ত দুধ, মাংস উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং দুধ-মাংসজাত দ্রব্য উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করতে লাগল। অন্যদিকে, পশু উপজাত দ্রব্য, যেমন- চামড়া, পশম, চর্বি, হাড়, রক্ত, খুর, শিং থেকে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় ও সৌখিন দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করে দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে লাগল। বর্তমান বিশ্বে তারা ধনী দেশ বলে গণ্য হচ্ছে। বর্তমানে সেসব দেশের বড় বড় খামার ও উপজাত দ্রব্যের শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেশ-বিদেশ থেকে আগত বহু লোক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা সম্প্রসারণে পশুসম্পদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখে ব্যক্তি, দেশ ও জাতির আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

সনাতন পদ্ধতিতে পশু পালনের কারণে এদেশে দারিদ্রতা দূর হচ্ছে না।

বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে গবাদিপশুর ভূমিকা

বাংলাদেশের জন্য গৃহপালিত পশু এক বিরাট সম্পদ। এদেশের আবহাওয়া পশুপালনের জন্য উপযুক্ত। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে গরু, ছাগল, মহিষ পালন করতে দেখা যায়। কিন্তু এখনও বহু জায়গায় সনাতন পদ্ধতিতে পশুপালন করা হচ্ছে। সেজন্য পশু আমাদের বড় সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও এদেশের বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র ও বেকার। সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পশুপালন করলে খুব সহজে কর্মসংস্থানের উপায় হবে। কর্মসংস্থানের উপায় হলে আর্থিক সচ্ছলতা আসবে ও দরিদ্রতা দূর হবে। নিম্নে আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে ছাগল, গরু, ভেড়া ও মহিষ কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারে সংক্ষেপে তা আলোকপাত করা হয়েছে।

দারিদ্র দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানে ছাগলের স্থান প্রথম।

ছাগল

দারিদ্র দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানে ছাগলের স্থান প্রথম। ছাগলকে গরীবের গাভী বলা হয়। ছাগল ছানার দাম অত্যন্ত কম। বিত্তহীন, ভূমিহীন দরিদ্র ব্যক্তি, যে কেউ দুটো ছানা ক্রয় করে পালন শুরু করতে পারেন। এগুলো পালন করতে শ্রম কম লাগে। বাড়ির আশেপাশে, জমির আইলে চরালে ও অল্প খাবার দিলেই চলে। বাসস্থান ও চিকিৎসা খরচ কম। দেশী ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বছরে দুবার ২-৪টি করে মোট ৪-৮টি বাচ্চা প্রসব করে। এ জাতের ছাগলের মাংস ও চামড়ার যথেষ্ট চাহিদা। তাই বেশি মূল্যে বিক্রি করা যায়। যমুনাপারি ছাগল দুধের জন্য পালন করা হয়। ছাগলের সংখ্যা বাড়িয়ে খামার করা যায়। এভাবে একজন বেকার ব্যক্তি একটি খামারের মালিক হতে পারেন। তারপর সে খামার বড় করে তাতে লোক নিয়োগ করতে পারেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দরিদ্র বেকার লোক

নিজের চেষ্টায় খামার গড়ে তুলতে পারেন ও সেসব খামারে বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন।

চিত্র ১১ ঃ ছাগল পালনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান করছে গ্রাম্য মহিলা

একটি পরিবারে সংকর জাতের দুটি গাভী থাকলে তাদের আর্থিক অসচ্ছলতায় কষ্ট পেতে হয় না।

গরু

হিসাব নিকাশ করে দেখা গেছে, একটি পরিবারে সংকর জাতের দুটি গাভী থাকলে তাদের আর্থিক অসচ্ছলতায় কষ্ট পেতে হয় না। অর্ধ বেকার, বেকার, দরিদ্র কৃষক কাজের সন্ধান পায়। যারা দরিদ্র তারা সহজ শর্তে সরকার থেকে ঋণ নিয়ে উন্নত জাতের গাভী, যেমন- হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান বাছুর ক্রয় করতে পারেন। তাছাড়া খুব কম মূল্যে দেশী গাভীর বকনা বাছুর ক্রয় করে পালন করা যায়। এক্ষেত্রে বাছুরটি প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিদেশী উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ দিয়ে প্রজনন করিয়ে উন্নত সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন করা যায়। উৎপন্ন বাছুর যদি ষাঁড় হয় তাহলে তা বেশি মূল্যে বাজারে বিক্রি করতে পারেন অথবা নিজে পালন করে শক্তি ও প্রজননের জন্য ব্যবসা করতে পারেন। বকনা বাছুর হলে তা পালন করে দুধের ব্যবসা করা যায়। ছাগলের মতো ধীরে ধীরে গাভীর সংখ্যা বাড়িয়ে গাভীর খামার তৈরি করা যায়। তাতে নিজের এবং আরও বহু মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া গবাদিপশুর খামারের সাথে সাথে গড়ে ওঠে খাদ্য ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরির শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ।

ভেড়ার মাংস ছাগলের মাংসের মতোই সুস্বাদু।

ভেড়া

বাংলাদেশে ভেড়ার জাত অনুন্নত। তথাপি ভেড়ার মাংসের ব্যবসা করা যায়। কারণ, ভেড়ার মাংস ছাগলের মাংসের মতোই সুস্বাদু। এছাড়া দেশী ভেড়াকে উন্নত জাতের ভেড়ার সাথে প্রজনন করানো যায়। এভাবে জাত উন্নয়ন করে দেশী ভেড়া থেকে উৎকৃষ্টমানের পশম উৎপাদন করা যায়। এ পশম দিয়ে শীতবস্ত্র তৈরি করা যায় অথবা কাঁচামাল হিসেবে বিদেশে রপ্তানি করা যায়। দেশী ভেড়ার পশম দিয়ে কার্পেট ও কম্বল তৈরির কাজে বেকার ব্যক্তিরা নিয়োজিত থাকলে বেকার সমস্যা দূরীকরণ ও অর্থ উপার্জন হবে। এতে ভেড়ার বদৌলতে আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্রতা দূর হবে।

একজোড়া মহিষ এক টন পর্যন্ত ভার বহন করতে পারে।

মহিষ

এদেশের মানুষের আত্মকর্মসংস্থানে মহিষের ভূমিকাও কম নয়। একজোড়া মহিষ এক টন পর্যন্ত ভার বহন করতে পারে। মহিষের মালিক মহিষের গাড়ি ভাড়া দিতে পারেন, নিজের জমি চাষে ব্যবহার করতে পারেন অথবা অন্যের জমি চাষের জন্য ভাড়া দিতে পারেন। মহিষের দুধে চর্বির পরিমাণ গড়ে ৬%। যারা মহিষ পালন করেন, মহিষের দুধ দিয়ে মাখন, ঘি, দই, মিষ্টি, পনির তৈরি করে ব্যবসা করতে পারেন। ২৪ মাসের কম বয়সের মহিষের বাছুর জবাই করে মাংস বিক্রি করা যায়। কারণ, এ বয়সের বাছুরের মাংস গরুর মাংসের মতোই খেতে সুস্বাদু এবং মাংসের আঁশ কম পুরু।

তাছাড়া ফসল মাড়াই, ইটের ভাটায় কাদা ছানা, গুড় তৈরি করা, আখ মাড়াই প্রভৃতি কাজের জন্য নিজে ব্যবহার করতে পারেন অথবা ভাড়া দিতে পারেন।

চিত্র ১২ ঃ মহিষের গাড়ি

অনুশীলন (Activity) ঃ *ধরুন, আপনি একজন বেকার যুবক। কষ্টেশিষ্টে আপনি অল্প কিছু টাকা সংগ্রহ করেছেন। এ পুঁজি দিয়ে কোন্ ধরনের পশুর খামার করলে সহজে লাভবান হবেন? আপনার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করুন।*

জবাইকৃত পশুর উপজাত দ্রব্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা যায়।

আত্মকর্মস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে পশু উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার

আমাদের দেশে প্রতিদিন অসংখ্য পশু জবাই হয়। তাছাড়া কোরবানির সময়ের কথা বলাই বাহুল্য, এসব জবাইকৃত পশু উপজাত দ্রব্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করার জন্য বিপুল বেকার জনগোষ্ঠিকে বিভিন্ন কর্মকান্ডে লাগানো যেতে পারে। তাতে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়। সরকার ও জনসাধারণের সমন্বয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে পশু উপজাত দ্রব্যভিত্তিক বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা এদেশে গড়ে ওঠবে। বেকার জনগণ পশু উপজাত ও বিভিন্নমুখী কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। ব্যক্তি ও জাতীয় অর্থ উপার্জনের পথ আবিষ্কার হবে। ফলে ব্যক্তির আত্মকর্মস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণের সাথে সাথে আমাদের দেশও ঐশ্বর্যশালী হবে।

বাংলাদেশে আত্মকর্মস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে পশুকেন্দ্রিক কর্মসূচি

- বেকার জনগোষ্ঠিকে উপজাত দ্রব্য সংগ্রহের কাজে লাগানো যেতে পারে।
- উপজাত দ্রব্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ছাড়াও এগুলো থেকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত করার প্রশিক্ষণ কোর্সও চালু করা যেতে পারে।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ভালো বেতন ও পদমর্যাদা দেয়া যেতে পারে। এতে এসব কাজে মানুষের আগ্রহ বাড়বে।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের সাহায্যে বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।

এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারলে বিদেশের মতো আমদের দেশেও বহু কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠবে।

১৯৯২ সালে বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে কিছু তথ্য

১৯৯২ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে, একক ও মিশ্র খামার মিলে ৪৭.৬৪% প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক আত্মকর্মসংস্থানে এবং ৪৭.৪৩% যুবক পশুপাখির প্রাথমিক চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া ৪১.৭১% প্রকল্প গ্রহণকারী যুবক মাসে ৫০০ টাকা পর্যন্ত এবং ৩১.৯৬% যুবক প্রায় ৫০০-১০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করেছেন। এ দুয়ে মিলে ৭৩.৪% যুবক ৫০০-১০০০ টাকা আয় করেছেন। একই পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১৯০৫ জন গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাকে গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি পালনে প্রশিক্ষণ দান করেছে। তাদের মধ্যে ৬০

জনের চাকুরি হয়েছে এবং ১০২০ জন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। তাদের মাসিক আয় গড়ে ৬০০-১০০০ টাকা। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সহযোগিতায় দেশের অবহেলিত নারী সমাজও হাঁসমুরগি পালন করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

সারমর্ম ঃ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে সহজেই স্বাবলম্বী হওয়া যায় ও দারিদ্র দূর করা যায়। আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরিকরণে গৃহপালিত পশুকে দু'ভাবে কাজে লাগানো যায়। যথা- ১. উন্নত জাতের পশু দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খামার করা এবং অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদন করা। ২. পশু থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপজাতসমূহ থেকে নানারকম দ্রব্যসামগ্রী তৈরির কুটির শিল্প গড়ে তোলা। পশুকেন্দ্রিক এ দু'টো দিকে বেকার জনগণকে নিয়োজিত করতে পারলে এদেশে পশুই হবে আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণের প্রধান উপায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। নিজের চেষ্টায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে কর্মে আত্মনিয়োগ করাকে কী বলে?
- ক) কর্মসংস্থান
- খ) আত্মকর্মসংস্থান
- গ) অর্থ উপার্জন
- ঘ) ঐশ্বর্যশালী হওয়া

২। মানব জাতির প্রথম কর্মসংস্থান কী ছিল?
- ক) শিকার করা
- খ) পশুপালন করা
- গ) রাখালি করা
- ঘ) কলুর কাজ করা

৩। বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে কোন্ গবাদিপশুর স্থান প্রথম?
- ক) মহিষ
- খ) ভেড়া
- গ) গরু
- ঘ) ছাগল

৪। আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণ হলে দেশ কী হবে?
- ক) ঐশ্বর্যশালী হবে
- খ) উন্নত হবে
- গ) ধনী হবে
- ঘ) সমৃদ্ধ হবে

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৬ পশু দিয়ে নিজ হাতে হালচাষ করা

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হালচাষের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারবেন।
- গবাদিপশুর কাঁধে জোয়াল বাঁধতে ও লাঙ্গল লাগাতে পারবেন এবং অন্যকে দেখাতে পারবেন।
- গরু দিয়ে নিজেই হালচাষ করতে পারবেন।

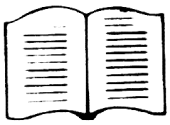

প্রাসঙ্গিক তথ্য

হালচাষ বা গবাদিপশু দিয়ে জমি কর্ষণ আমাদের দেশে একটি অতি পুরাতন পেশা যা কৃষির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য। গ্রাম বাংলার কৃষকরা ভোর না হতেই লাঙ্গল কাঁধে মাঠের পানে ছুটেন। দৃশ্যটি খুবই মনোরোম। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কৃষক মাঠে যাওয়ার আগে তার গরু, লাঙ্গল, জোয়াল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে নেন। জমি, গরু, লাঙ্গল ও মই এই চারটি উপকরণ সমন্বয়ে জমিতে অধিক ফসল ফলানো সম্ভব।

গবাদিপশু দিয়ে হালচাষ করা এদেশের কৃষকের অতি পুরাতন পেশা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

জমি, একজোড়া বলদ, লাঙ্গল, জোয়াল, মই, শলা, টুই, রশি ইত্যাদি।

পূর্ব প্রস্তুতি

সকাল বা বিকেলে হালচাষ করা উচিত। লাঙ্গল, জোয়াল, মই প্রভৃতি দিয়ে হাল-চাষ করা হয়।

- হালচাষের জন্য সকাল অথবা বিকেলে সময় নির্ধারণ করুন।
- হালচাষে যাবার পূর্ব রাতে গরুকে ভালোভাবে ঘাস ও দানাদার খাবার দিন।
- হালচাষের জন্য মাঠে যাবার পূর্বে গরুকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিষ্কার পানি পান করান।
- কীভাবে গরুর জোয়াল এবং জোয়ালের সাথে লাঙ্গল বাঁধতে হয় তা পার্শ্ববর্তী কৃষকের বাড়িতে গিয়ে তার কাছে শিখুন এবং নিজে করার জন্য চেষ্টা করুন।

প্রধান কর্ষণ যন্ত্রপাতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

লাঙ্গলের বিভিন্ন অংশ হলো কাঠের শরীর, ঈশ, খিল, হাতল, ফাল ইত্যাদি।

দেশী লাঙ্গল

বাংলাদেশে এটি অতি পরিচিত কর্ষণ যন্ত্র। একটি বাঁকা কাঠের আগায় লোহার একটি ফলক বা ফলা সন্নিবেশে এটি প্রস্তত করা হয়। এর বিভিন্ন অংশ নিম্নরূপ-

কাঠের শরীর ঃ লাঙ্গলের শরীর গজারি, বেল, কুল প্রভৃতি কাঠের বাঁকা কান্ড দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। শরীরের উপরের অংশকে বলা হয় হাতল। হাতলের শেষ প্রান্তে মুটি থাকে। এই মুটি চেপে ধরে কৃষকরা লাঙ্গল চালিয়ে থাকেন। শরীরের নিচের সরু অংশে ফলক লাগানো হয়। শরীরের মধ্যবর্তী জায়গায় একটি ছিদ্র করা হয় এবং সে ছিদ্রে ঈশ সংযোজন করা হয়।

ঈশ ঃ এটি একটি সরু চ্যাপ্টা কাষ্ঠদন্ড যা লম্বায় ২.৫ মিটার অর্থাৎ প্রায় আট ফুট। ঈশের গোড়ার অংশ লাঙ্গলের শরীরের ছিদ্রপথে শক্তভাবে আটকানো থাকে, ঈশের অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত চিকন বা সরু হয়। এতে ৪-৫টি দাঁত বা খাঁজকাটা হয়। এ দাঁতগুলোর যে কোনো একটি রশি বেঁধে জোয়ালের সঙ্গে লাঙ্গল লাগানো হয়।

খিল ঃ ঈশ লাঙ্গলের শরীরের ছিদ্রের মধ্যে শক্ত করে আটকানোর জন্য একটি কাঠের টুকরো ব্যবহার করা হয়। দেশীয় কাথায় একে খিল বা গোঁজ বলে।

হাতল ঃ লাঙ্গলের শরীরের উপরের যে অংশ হাতে ধরে গরুর সাহায্যে লাঙ্গল চালনা করা হয়, তাকে হাতল বলে। হাতলের উপরের প্রান্তে মুটি থাকে। এই মুটিতে চাপ প্রয়োগ করে চাষি গরু দিয়ে জমি চাষ করেন।

ফলক ঃ গ্রাম্য ভাষায় এটিকে লাঙ্গলের ফাল বলে। এটি নরম স্টিলপাত বা লোহার পাত দিয়ে তৈরি এবং লম্বায় ১৫-১৭ সেন্টিমিটার। লাঙ্গলের সরু আগার উপরের দিকে লোহার পিন দিয়ে ফলকটি আটকে দেয়া হয়। এ ফলার সাহায্যেই লাঙ্গল মাটি চিরে জমি কর্ষণ করে ।

চিত্র ১৩ ঃ দেশী লাঙ্গল

জোয়াল ছাড়া শুধু লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করা সম্ভব নয়।

জোয়াল

জোয়াল ভূমি কর্ষণের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জোয়াল ছাড়া লাঙ্গল দিয়ে ভূমি কর্ষণ সম্ভব নয়। জোয়ালের দু'প্রান্ত রশি দিয়ে একজোড়া গরুর কাঁধে বেঁধে দেয়া হয়। লাঙ্গলের ঈশ রশির সাহায্যে জোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে বেঁধে জমি কর্ষণ করা হয়। জোয়াল কাঠের অথবা বাঁশের হতে পারে। জোয়াল যেন বলদের কাঁধের নির্দিষ্ট স্থানে থাকে সেজন্য বাঁশের দু'টি শলা দু'প্রান্তে এবং রশি দিয়ে জোয়ালকে কাঁধের সাথে বাঁধা হয়।

চিত্র ১৪ ঃ জোয়াল

আমাদের দেশে প্রধানত বাঁশের তৈরি মই ব্যবহৃত হয়।

মই

আমাদের দেশে প্রধানত বাঁশের তৈরি মই ব্যবহৃত হয়। বাশেঁর তৈরি মই মোট তিনটি ফালি দিয়ে তৈরি হয় যার মধ্যবর্তী ফালিটি সোজা রাখা হয়। দু'পার্শ্বের দু'টি ফালি কতকটা অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁকানো থাকে এবং গাইট দিয়ে সংযোজন করা হয়। গাইটগুলোর প্রায় ৩.৭৫ সে.মি. (১.৫ ইঞ্চি) করে উভয়দিকে বাড়তি রাখা হয়। প্রান্তিক গাইট দু'টির মাথায় পাটের রশি দিয়ে জোয়ালের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। দু'টি সোজা বাঁশের ফালি দিয়েও মই তৈরি করা যায়।

চিত্র ১৫ ঃ মই

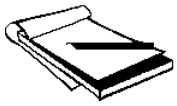

অনুশীলন (Activity) ঃ *ধরুন, আপনার এক টুকরো জমি আছে; হালচাষের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ করে সেটি নিজে চাষ করুন।*

হালচাষের মাঝখানে গরুকে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম দেয়া প্রয়োজন। কখনোই গরু দিয়ে দৈনিক ৪-৬ ঘন্টার বেশি হালচাষ করানো ঠিক নয়।

কাজের ধাপ

- প্রথমে নিজ হাতে জোয়াল্‌টি বলদ দু'টোর দু'কাঁধে পাটের রশি দিয়ে বাঁধুন। এরপর লাঙ্গলের ঈশটিকে জোয়ালের সাথে জোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে ভালোভাবে বাঁধুন।
- এরপর লাঙ্গলের মাথার মুটি বাম হাতে শক্তভাবে সোজা করে ধরুন যাতে লাঙ্গলের ফালটি জমির বুকে ঢুকে যায়।
- চাষ করার সময় গরুর সাথে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় কথা বলুন যাতে গরু আপনার নির্দেশনা বুঝতে পারে।
- গরুর প্রতি কখনো নিষ্ঠুর আচরণ করা ঠিক নয়। হাতের শলা দিয়ে গরুকে ডানে/বামে চলার নির্দেশনা দিন।
- হালচাষের মাঝামাঝি সময়ে গরুকে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম দেয়া প্রয়োজন। পরে আবার চাষাবাদ শুরু করা যেতে পারে।
- কোনো অবস্থাতেই দৈনিক ৪-৬ ঘন্টার বেশি সময় একই গরু দিয়ে হালচাষ করা সমিচীন নয়।
- হালচাষ চলাকালীন সময়ে গরু বা হালের যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সমস্যা দেখা দিলে প্রতিবেশী অভিজ্ঞ কৃষকের সাথে আলাপ করে সমাধান করুন।
- হালচাষের পর গরুকে ঘরে উঠানোর পূর্বে পুকুর বা খালে ভালোভাবে গোছল করান। ব্রাশ দিয়ে তাদের শরীর পরিষ্কার করে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস, দানাদার খাদ্য ও পানি দিন এবং পরিষ্কার জায়গায় রাখুন যাতে বিশ্রাম নিতে পারে।
- লাঙ্গলসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করে সযত্নে উঁচু জায়গায় তুলে রাখুন।
- আপনি নিজে হালচাষ করুন এবং ধাপগুলো ব্যবহারিক খাতায় পর্যায়ক্রমে লিখুন।

হালচাষ শুরু করার পূর্বে লাঙ্গলসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং গরু ভালোভাবে পরীক্ষা করা উচিত।

সাবধানতা এবং করণীয়

- হালচাষে যাবার আগে লাঙ্গলসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ভালোভাবে পরীক্ষা করুন।
- হালের গরুকে প্রত্যেহ নির্ধারিত সময় ঘাস ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ করুন এবং গোছল করান। ব্রাশ দিয়ে শরীর পরিষ্কার করুন। গরুর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন।
- সর্বদা গরুর কাছে পরিষ্কার খাবার পানি রেখে দিন।
- প্রত্যেহ নির্ধারিত সময়ে হালচাষ করুন। এতে গরু অভ্যস্থ হয়ে যাবে।
- লাঙ্গলের মুটি শক্ত করে না ধরলে ফালা যে কোনো সময় গরুর পায়ে লেগে পা কেটে যেতে পারে। এদিকে সতর্ক থাকুন।
- জোয়াল ব্যবহারের ফলে পশুর দেহে যেন কোনো ক্ষত সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

সারমর্ম ঃ এদেশে হালচাষ প্রধানত গবাদিপশু দিয়েই করা হয়। সকাল বা বিকেল হলো জমি চাষ করার উপযুক্ত সময়। লাঙ্গল, জোয়াল, মই প্রভৃতির সাহায্যে গরুমহিষ দিয়ে হালচাষ করা হয়। গরু দিয়ে দৈনিক ৪-৬ ঘন্টার বেশি হালচাষ করা ঠিক নয়। হাল-চাষের মাঝখানে গরুমহিষকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেয়া প্রয়োজন। হালচাষ শুরু করার পূর্বে লাঙ্গলসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং গরু ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেয়া উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। হালচাষ করার জন্য আপনি কোন্ সময় নির্ধারণ করবেন?
- ক) দুপুর
- খ) সন্ধ্যা
- গ) রাত
- ঘ) সকাল অথবা বিকেলে

২। হালচাষ করার পূর্ব রাতে গরুকে কী খাবার দিবেন?
- ক) দানাদার খাদ্য
- খ) খড়
- গ) ঘাস
- ঘ) ঘাস ও দানাদার খাদ্য

৩। একই গরু দিয়ে দৈনিক কত ঘন্টার বেশি হালচাষ করা যাবে না?
- ক) ৪-৬ ঘন্টা
- খ) ২-৪ ঘন্টা
- গ) ১-২ ঘন্টা
- ঘ) ৩-৫ ঘন্টা

৪। লাঙ্গলের ফলক কত সে.মি. লম্বা হয়?
- ক) ১০-১২ সে.মি.
- খ) ১৫-১৭ সে.মি.
- গ) ৬-৮ সে.মি.
- ঘ) ২০-২২ সে.মি.

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৭ গরুর দুধ দিয়ে দই বা যে কোনো একটি খাদ্য তৈরি করা

এই পাঠ শেষে আপনি-

- দই তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- দুধ দিয়ে নিজ হাতে মজাদার দই তৈরি করতে পারবেন।

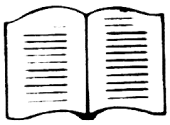

প্রাসঙ্গিক তথ্য

দই বাংলাদেশে অতি জনপ্রিয় দুগ্ধজাত খাদ্য। যে কোনো ভোজে দই পরিবেশন করা না হলে সে ভোজের উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। ভোজ অনুষ্ঠানকারী সমালোচনার সম্মুখীন হন। ভোজের সাফল্য অনেকাংশেই পরিবেশিত দইয়ের মানের ওপর নির্ভর করে। দই সাধারণত দুপ্রকার। যথা- টক ও মিষ্টি দই। টক দই সাধারণত রান্নাবান্না ও সালাদ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তবে, অধিক টক না হলে খাদ্যের সাথেও পরিবেশন করা যায়।

বাংলাদেশের অতি জনপ্রিয় দই দু'প্রকারের। যথা- টক ও মিষ্টি দই।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

দুধ, ডেকচি, মাটির পাত্র, সাঁচ, চিনি, লাকড়ি বা গ্যাসের চুলো।

দই তৈরি করার জন্য ৪০-৪৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দুধে সাঁচ মেশাতে হয়।

কাজের ধাপ

- প্রথমে সদ্য দোহনকৃত পাঁচ লিটার কাঁচা দুধ ভালোভাবে ছেকে নিন।
- নির্ধারিত পরিমাণ দুধ অল্প জ্বালে ফুটাতে থাকুন। তবে, লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দুধ পুড়ে না যায়।
- দুধের আয়তন ১/৩ অংশ কমে গেলে তাতে ১৫-১৮% পরিষ্কার চিনি সম্পূর্ণভাবে মেশান। মিষ্টি দই তৈরিতে প্রতি লিটার দুধে এই হারে চিনি মেশান।
- ফুটন্ত দুধ নতুন মাটির পাত্রে ঢেলে রাখুন এবং শুষ্ক ও বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত কক্ষে রাখুন।
- যখন দুধের তাপমাত্রা ৪০-৪৫° সেলসিয়াসে নামবে তখন চা-চামচের ২/৩ চামচ সাঁচ বা কালচার যোগ করুন। কালচার বা সাঁচ পাতিলে মেশানোর পর দুধ স্থিরভাবে পাত্রে ঢেলে রাখুন।
- তারপর ৪-৫ ঘন্টা দুধের পাত্রগুলো ভালো করে ভারি কাপড় বা অন্য কোনো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন অথবা ওভেনে রাখুন। মোটামুটিভাবে ২৪ ঘন্টায় দই হয়ে যাবে।
- দইয়ের আকৃতি শক্ত করার জন্য ৫% গুঁড়ো দুধ ফুটানোর পূর্বে যোগ করা যেতে পারে।

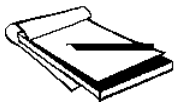

অনুশীলন (Activity) ঃ *ধরুন, আপনি তিন লিটার কাঁচা দুধ দিয়ে মিষ্টি দই বানাবেন। এই পরিমাণ দই বানাতে মোট কতটুকু চিনি, সাঁচ ও গুঁড়ো দুধ মেশাতে হবে তা হিসেব করে বের করুন।*

দই সংরক্ষণ ও সাবধানতা

- জমাট বাঁধার পর দই রেফ্রিজারেটরে রাখলে ভালো থাকবে।
- তাপ নিয়ন্ত্রণ আমাদের দেশে একটি সমস্যা। তাপ কমে গেলে (অর্থাৎ শীতের সময়) দই খারাপ হয়ে যেতে পারে।
- মাটির পাত্র বিধায় দই তৈরির পর সাবধানে নাড়াচাড়া করা উচিত।
- বেশি সাঁচ বা কালচার দিলে দই টক হয়ে যেতে পারে। ভালো কালচার হলে দইয়ের স্বাদও ভালো হয়।
- আমাদের দেশে শীতকাল ব্যতীত বছরের অন্য সময় খোলা জায়গায় রেখে দই তৈরি করা যায়। শীতকালে ওভেনে রাখার দরকার আছে। দই হওয়ার জন্য ৩৮-৪০° সে. তাপমাত্রাই উত্তম।

বেশি সাঁচ দিলে মিষ্টি দইও টক হয়ে যায়।

সারমর্ম ঃ দই অত্যন্ত জনপ্রিয় দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য। টক ও মিষ্টি দুপ্রকারের দই রয়েছে। কাঁচা দুধ অল্প জ্বালে ফুটিয়ে এর আয়তন এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনতে হয়। অতঃপর ১৫-১৮% চিনি যোগ করা হয়। ৪০-৪৫° তাপমাত্রায় দুধে সাঁচ যোগ করা হয়। দই শক্ত করার জন্য এতে ৫% গুঁড়ো দুধ যোগ করা হয়। বেশি সাঁচ দিলে মিষ্টি দইও টক হয়ে যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কোন্ জাতীয় পাত্রে আপনি দই প্রস্তুত করবেন?
- ক) অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র
- খ) কাচের পাত্র
- গ) মাটির পাত্র
- ঘ) টিনের পাত্র

২। দই প্রস্তুত করার জন্য দুধের পাত্রগুলো কতক্ষণ ওভেনে রাখবেন?
- ক) ৪-৫ ঘন্টা
- খ) ৫-৬ ঘন্টা
- গ) ৬-৭ ঘন্টা
- ঘ) ৭-৮ ঘন্টা

৩। জমাট বাঁধার পর দই কোথায় রাখলে ভালো থাকবে?
- ক) রেফ্রিজারেটরে
- খ) টেবিলের উপর
- গ) আলমারির ভেতর
- ঘ) ফ্রিজারের ভেতর

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ১

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। গৃহপালিত পশু বলতে কী বুঝায়? আদি যুগে জঙ্গলে পশু শিকার করতে কী কী বাধা আসত?
২। বাংলাদেশে পশুপালনের বর্তমান অবস্থা বর্ননা করুন।
৩। বাংলাদেশের পশুসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে জনসাধারণ ও সরকারের করণীয় সর্ম্পকে লিখুন।
৪। আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে বর্বর যুগে পশুর কী ভূমিকা ছিল?
৫। শিল্প ও বিজ্ঞানযুগে আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে পশুর ভূমিকা কীভাবে ব্যাপক হলো তা আলোচনা করুন।
৬। প্রাচীনকাল থেকে এদেশে কী ধরনের গরু পালন করা হতো?
৭। দুধের গুণাগুণ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য লিখুন।
৮। দুধ উৎপাদনে গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৯। মহিষের দুধ উৎপাদন সম্পর্কে আপনি যা জানেন লিখুন।
১০। ফসল উৎপাদন করার জন্য পশুশক্তি কোন্ কোন্ কাজে ব্যবহৃত হয়?
১১। পশুচালিত পরিবহণ কোথায় এবং কেন ব্যবহৃত হয়?
১২। ঈশ কাকে বলে? ঈশ দেখতে কেমন?
১৩। আপনি কি লাঙ্গলের ফলক দেখেছেন? ফলকের বৈশিষ্ট্য বলুন।
১৪। দই তৈরিতে কী কী উপকরণ প্রয়োজন?
১৫। দই সংরক্ষণে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করবেন?

উত্তরমালা - ইউনিট ১

পাঠ ১.১
১। খ ২। ক ৩। গ ৪। খ

পাঠ ১.২
১। ক ২। ক ৩। খ ৪। ঘ

পাঠ ১.৩
১। খ ২। ক ৩। ক ৪। গ ৫। খ

পাঠ ১.৪
১। ক ২। গ ৩। ক ৪। ক

পাঠ ১.৫
১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। ক

পাঠ ১.৬
১। ঘ ২। ঘ ৩। ক ৪। খ

পাঠ ১.৭
১। গ ২। ক ৩। ক